KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৩/২ এ. বীরেন সেন সরণী, কল-৫
Collection : KLMLGK	Publisher : মহম্মদ আক্তার সামসুদ্দিন (1, 2) আতিকুর সামসুদ্দিন (2/1)
Title : অ (A)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2 2/1 2/3 3/1	Year of Publication : Aug 1981 Nov 1981 Aug 1982 Feb 1983 Aug 1983 Condition : Brittle Good ✓
Editor : আতিকুর সামসুদ্দিন	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।

অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ

অ অ
অ অ
অ অ
অ অ
অ অ

অ

২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,
আগস্ট, ১৯৮২

শতরূপা সান্যাল
সম্পাদিত

লিখেছেন :

কালিদাস রায়
ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড
জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
স্বস্তি মণ্ডল
লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ
রথীন্দ্রনাথ রায়
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তাপস সিংহ
শতরূপা সান্যাল
নন্দন সেনগুপ্ত
নন্দিতা সেনগুপ্ত
স্বর্ণেন্দু সেন

Phone :
77-3346

DEEBEE ENTERPRISE

THAKURPUKUR ROAD
CALCUTTA-7000064

Manufacturers of :

DOMESTIC WATER FILTER OF DIFFERENT CAPACITY.

Phones : 21-2737
24-2194

D I K A R T O N

106/1-A, S, N. Banerjee Road,
Calcutta-700014.

PLEASE CONTACT FOR :

1. Industrial Security Guards,
2. Private Detection Work.

Phones : 33-9793
62-2266

Choudhuri Electronic Industries

Manufacturers of ;
Sunbright Multichannel Telebooster (AC/DC) CEI Brand
&
For BANGLADESH T V. PROGRAMME
Sunbright Tele Booster. 11 Element Antena Anodic Special.

শুভেচ্ছা সহ—

শতাব্দীর নাট্য সংস্থা

৬।৯, কালীচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৫০

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভবানী পাঠকের উৎস

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রকৃতি নিরূপণ এবং রসবিচারে পাঠক তথা সমালোচকের যাতে বিভ্রান্তি না ঘটে, বোধ হয় এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের বিজ্ঞাপনেই সে সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন, 'উপন্যাসটির একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে'। বলেছেন, "যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্তৃক সংকলিত এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account'-এর মধ্যে রঙ্গপুর জেলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।" স্বভাবতঃই উপন্যাসের প্রয়োজনে তৎকালীন দেশের অবস্থা সম্পর্কেও ঔপন্যাসিক নীরব থাকেন নি ঃ "তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে, ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার কয়েক বছর হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিস্টর হলে দাঁড়াইয়া এডমণ্ড বার্ক সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন।"[১]

হাণ্টার সাহেবের বিবরণ[2] থেকে জানা যায়, ভোজপুরী ব্রাহ্মণ, দুর্ধর্ষ ডাকাত ভবানী পাঠক ও তার রাজপুত অনুচরবৃন্দকে দমন করার জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্রেনান-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান ঘটে ঃ একজন স্থানীয় কর্মচারীর সহায়তায় ২৪ জন সৈন্য সহ অতর্কিতে ভবানী পাঠকের নৌকা আক্রমণ করা হয় এবং এর ফলে ভবানী পাঠক সমেত তাঁর তিনজন অনুচর নিহত, আটজন আহত ও বিয়াল্লিশ জন বন্দী হয়। হাণ্টারের বিবরণীতে 'দেবী চৌধুরাণী' নামে এক দস্যুনেত্রীর উল্লেখও আছে। এর থেকে ভবানী পাঠক চরিত্রের একটি সূত্র পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে চরিত্রটির তাত্ত্বিক অর্থাৎ অনুশীলনধর্ম ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মব্রতের দিকটিও বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হল মূলতঃ এই :

আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, 'যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে তাহা, অর্থাৎ 'দেবী চৌধুরাণী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। * * * আর, হেস্টিংস

লাট হইবার পর (১৭৭২ খৃঃ) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন। বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশোনা ছিল এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে তিনি পঠিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়াছেন।"৩ উদ্ধৃত অংশটিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে যে, প্রফুল্লের শিক্ষা সমাপনান্তে তার কাছে কাছারির কর্মচারীদের ভয়াবহ অত্যাচারের যে বর্ণনা বাগ্মী ভবানী পাঠক দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক সূত্রটি কি? যেহেতু হাণ্টার সাহেবের বিবরণে বিষয়টির কোন উল্লেখ পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎকালীন সারস্বত সমাজের যে পরিচয় আমাদের জানা আছে তার থেকে 'বাগ্মী ভবানী পাঠকে'র উৎস সন্ধানকেই আমাদের প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন বলে মনে হয়। এবং বঙ্কিমের কালকে স্মরণে রেখে যেসব রাগ্মীদের কথা আমাদের মনে পড়ে তার মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইম্পীচ্‌মেন্ট খ্যাত এডমণ্ড বার্কের (১লা জানুয়ারী, ১৭৩০ খৃঃ—৯ই জুলাই, ১৭৯৭ খৃঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা আগেই দেখেছি বার্ক ও তাঁর সুবিখ্যাত বক্তৃতা বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ইংরেজের রাজ্যশাসনের ধারা, দেবী সিংহের ভয়াবহ অত্যাচার ও সামাজিক অরাজকতার যে পরিচয় বার্কের বক্তৃতার প্রকাশিত হয়েছে তার কতটা কিভাবে ভবানী পাঠক চরিত্রটির তথা সমগ্র উপন্যাসটির ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিচার প্রয়োজন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইম্পীচমেণ্টকালে প্রদত্ত বার্কের বক্তৃতায় তৎকালে বাংলায় ইংরাজ ও তার কর্মচারীবৃন্দের অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই। "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে এই অত্যাচারের বিবরণটি বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে উপস্থিত করেছেন ঃ

"ভবানী। আমি রাজত্ব করি।

প্রফুল্ল। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া?

ভ। শুন বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্য পরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যাধিকারীর দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারদের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রী জাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়।"৪

—এই পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা যেন সেই "সাগর পারের ওরেষ্ট মিনিস্টর হলে" পৌছে যাই যেখানে মনীষী বার্ক ইতিহাসের এক ঘৃণ্যতম, হিংস্রতম অধ্যায়কে আগ্নের ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। বাঙালীর পক্ষে বার্কের এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যদি কোন আত্মসম্মানের বোধ জাগে, যদি আদর্শে উজ্জ্বল ইংরাজ চরিত্রের দীপ্তিতে একদিকে আমরা অভিস্নাত হতে পারি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মুখোশ সরিয়ে তার স্বার্থপরতার প্রখর নখ-দন্তের ঝলকানি দেখতে পারি তবে বোধহয় বার্কের সেই মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে। তাই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও ইতিহাস মন্দিরের সেই রঙ্গমঞ্চে আশা করি ধৈর্য নিয়েই আমরা প্রতীক্ষা করে থাকব ঃ

(বক্তৃতার তৃতীয় দিন ; ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৮ খৃঃ) ঃ

"My Lords, I am here obliged to offer some apology for the horrid scenes I am about to open. Permit me to make the same apology to your Lordships, that was made by Mr. Patterson—a man with whose name I wish mine to be handed down to posterity, His apology is this—and it is mine —that the punishments inflicfed upon the Ryots of Rungpore and Dinajpore, were, in many instances of such a nature, that I would rather wish to draw a veil over them, than shock your feelings by a detail.

But it is necessary for rhe substancial ends of justice and humanity, and for the honour of government, that they should be exposed and handed down to after ages : let this be my apology, My Lords, when the people had been stripped of everything, it was, in some cases suspected, and justly, that they had hid some share of the grain. Their bodies were then applied to the fierest mode of toriure, which was this : they began with winding cords about their fingers, till the flesh on eachhand clung and was actually incorporated. Then they hammered wedges of wood and iron between those fingers, until they crush maimed those poor. honest and laborious hands which were never lifted up to their mouths but with a scanty supply of provisions. * * * The heads of the villagers, the leading yeomen of the country, respectable for their virtues, respectable for their age were tied togather, two and two, the unoffending and helpless, thrown accross a bar, upon which they were hung with their feet uppermost and there beat with bamboo canes, on the soles of those feet, untill the nails started from their toes ; and then, with the crudgels of their blind fury those poor wretches were afterwards beat about their head, untill the blood gushed out at their mouth, nose and ears. My Lords, they did not stop here, Bamboos' wangees, rattans, canes, common whips and scourges, were not sufficient. They found a tree in the country which bears strong and sharp thorns—not satisfied with this, but scarching everything through the deepest parts of nature, where she seems to have forgot her usual benevolence, thcy found a poisonous plant, a deadly caustic, that inflame the part of that is bruised and often occasions death, This they applied to those wounds, * * * the innocent children were brought forth, and cruelty scourged before the faces of their parents. * * * My Lords, this was not, this was not all ! The treatment of the females cannot be described. virgins that were kept from the sight of the sun, were drogged into public Court—that Court which was intended to be a refuge against all eppression and there, in the presence of

day, their delicacies were offended and their persons cruelty violeted by the basest of mankind. It did not end there : the wives of the men of the country only suffered less by this : they lost their honour in the bottom of the most cruel dungeons, in which they were confined, They were thendragged out naked, and in that situation exposed to public view, and scourged before all the people, My Lords, here is my authority—for otherwise you will not believe it possible, My Lords, what will you feel when I tell you, that the put they nipples of sharp bamboos and tore, them from their bodies, What modesty in all nations most carefully conceals, these monstars revealed to view and consumed by burning tortures and cruel slow fire ! My Lords, I am ashamed to open it—horrid to tell ! these infernal fiends, these monstrons tools of this monster Debi Singh, definance of evarything divine or hnman, planted death in the source of life."৫

(এরপরেই আবেগরুদ্ধ বার্ক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেদিনের মতো বক্তৃতা স্থগিত থাকে।)৬

বস্তুতঃ, ভবানী পাঠকের মুখে বার্কের জ্বালাময়ী ভাষণের ভাবানুবাদ প্রকাশ করা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অসাধারণ শিল্প চাতুর্যের পরিচয় . 'এ দুর্ভাগ্য দেশে' দেবী সিংহ ও তার প্রভু ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিবাদের যে কণ্ঠ ছিল না, সুদূর সাগরপারে হেষ্টিংসের দেশেই তার তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে। শতাব্দীকাল পরে এক অভিনব ভবানী পাঠক রচনায় বঙ্কিম বার্কের অমর বাণীকে প্রতিধ্বনিত করে একদিকে যেমন তাঁর সৃষ্টিকে অমর করে গেছেন, অপরদিকে তেমনি বাঙালীর পদাহত পৌরুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—মেকলে প্রদত্ত 'বাঙালী' সংজ্ঞার সংশোধন করেছেন। মানবাত্মার অসম্মানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বাক্‌শক্তির নামই বার্ক। ভবানী পাঠক যেন প্রহরণধারী বার্ক। হেষ্টিংসকে শাস্তিদানে অক্ষম রাজশক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে যেন এক শতাব্দী পরে বার্কের বাক্‌শক্তি অস্ত্রধারণ করে ভবানী পাঠকের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছে।

আগামী ১৯৮৮ খৃঃ-তে বার্কের বক্তৃতার দ্বিশতবর্ষপূর্তি। এ পর্যন্ত বার্কের (এবং প্রসঙ্গত লর্ড শেরিডনের) স্মরণীয় সেই ভাষণের সার্থক বঙ্গানুবাদ বা তার

চেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বাংলার বিদগ্ধজন এই বিষয়ে অগ্রসর হলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধতর হবে বলেই আশা করা যায়।

॥ উল্লেখ পঞ্জী ॥

১, ৩, ৪ : বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড, সমগ্র উপন্যাস) : সাহিত্যসংসদ।

২ : A Statistical Account of Bengal (Rungpore) : W, W. Hunter,

৫, ৬ : The Speeches of Chattam, Sheridan, Ereskine & Burke (Voi, I) ; 3rd Edn. 1853 : Aylatt & Co, ; 8, Patterson Row Edinburg ; Pages—858—860.

লেখকের নিবেদন : এই প্রবন্ধ রচনার্থে প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ইত্যাদির মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রীঅশোক উপাধ্যায় রচিত "বঙ্কিম প্রসঙ্গপঞ্জী" (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত : বৈশাখ—ভাদ্র, ১৩৮৩) শীর্ষক গ্রন্থতালিকা, যাতে এযাবৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রাদিতে ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত যাবতীয় রচনাদির সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় রচনাদি পাঠে দেখা যায় সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। সেহেতু পঠিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদির বিশদ উল্লেখ অবান্তর। গ্রন্থতালিকা রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ ডঃ অনক রায় ও তাঁর কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী করেছেন। বঙ্কিম প্রসঙ্গেও তাঁরা (সম্ভবতঃ শ' আড়াই গ্রন্থের) একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের আগেই। এজন্য শ্রী উপাধ্যায় তাঁর তালিকায় ঐ গ্রন্থাদির উল্লেখ করেন নি। ডঃ রায়ের তালিকানুযায়ী পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি ; তালিকাটি সংগ্রহ করতে পারিনি বলে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ও শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—স্বস্তি মণ্ডল

নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একদা বিতর্কিত ও অধুনা বিস্মৃতপ্রায় একটি নাম। এই দুটি দিকই লেখক তাঁর জীবৎকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে থেকেই বাংলার পাঠকসমাজে তাঁর স্মৃতিক্ষীণ হয়ে আসে। বর্তমানে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিও প্রায় বিলুপ্তির পথে। অথচ, ১৯২০—৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তা নিছক ব্যক্তিগত খেয়াল নয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ব্যতিরেকে শতাব্দীর প্রথমাংশের ঔপন্যাসিক বলতে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর নাম করতে হয়। কিন্তু তিনি শুধু অনেকের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত একটি নাম হয়েই ফুরিয়ে যাননা ; অথবা তাঁর সমসাময়িক চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮—১৯৩৮) ও অব্যবহিত পরবর্তী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭) প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে উল্লেখ করেই তাঁর প্রতি দায়িত্ব শেষ হয় না। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ শতবর্ষের নিরীক্ষায় তাঁর ঔপন্যাসিক—স্বভাবটি নিঃসন্দেহে বিশেষ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে প্রায় শরৎ চন্দ্রের (১৮৭৬—১৯৩৮) সমকালীন। কিন্তু শিল্পদৃষ্টি ও ক্ষমতার প্রাচুর্যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রযুগে অপরাজেয় ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। নরেশচন্দ্র শরৎ চন্দ্রের ভাবধারার সশ্রদ্ধ-অনুগামী হয়েও স্বীয়বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র লেখক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর রচনায় একধরণের 'চড়াসুর' ফুটে উঠতে দেখে অনেকেই তাঁকে 'অতিবাস্তববাদী' বা 'ন্যাচারালিষ্ট' বলেছেন। আবার একদল তাঁকে 'সমাজবিধ্বংসী' বলে নিন্দাও করেছেন। কিন্তু এই ন্যাচারালিজম্-এর প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি সমকালীন আধুনিক তরুণদের পুরোধারূপে চিহ্নিত হলেন। তাঁর রচনায় বাস্তব জীবনের বহুবিধ-সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের আত্মিক সংঘাত, আসক্তি, ঈর্ষা, অনাচার দেহচেতনা ও প্রবৃত্তির বিচিত্রকুণ্ঠাহীন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেইসঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অসাম্য, ধনবণ্টন-নীতির ব্যর্থতা, ভূমিনির্ভর জীবনে শোষণ আর

অনাচারের ইতিহাস, যুদ্ধান্তের অবিসংবাদিত ফলস্বরূপ সামগ্রিক মূল্যবোধের বিনষ্টিতার উপন্যাস-গল্পের মূল বিষয়। মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে নানাভাবে উদ্ঘাটিত করে, জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে নৈবক্তিকভাবে বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলা উপন্যাসে জীবনমুখী দিকটির বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। বস্তুতঃ, নরেশচন্দ্র মানুষের মনুষ্যত্বের গভীরে প্রবেশ করে তার সুপ্তচৈতন্য ও প্রবৃত্তির অন্ধকার দিকটির স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে 'পাপ', 'পুণ্য' প্রভৃতি গতানুগতিক অভিধায় আবদ্ধ না থেকে 'জীবনটা যেমন', সেইরকমটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বহু আলোচিত উপন্যাস "শুভা" (১৯২০), "পাপের ছাপ" (১৯২২), "শান্তি" (১৯২৩), "বিপর্যয়" (১৯২৪), "রাজসী" (১৯২৫) প্রভৃতিতে তিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেহ-মনের জটিলদ্বন্দ্ব ও পরিণতি দেখিয়েছেন। জীবনের ত্রই অনাবৃত নগ্নদিকটি উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র গুপ্তের মতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত হানেননি বা রূঢ় অথচ স্থূল সত্যকে উহ্য রেখে আকারে-ইঙ্গিতে-সংকেতে অন্তরের জ্বালা প্রকাশ করেন নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা সোজাসুজি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি দেশকাল সমাজবন্ধনে আবদ্ধ মানবজীবনকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে আদিম জৈব-রহস্যকে টেনে বের করাই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তির 'অমোঘ শক্তির দাপট' দেখাতে গিয়ে তিনি যথাসাধ্য হৃদয়াবেগ বর্জন করেছেন ও ভাবালুতামুক্ত হয়েছেন। তাই মানবজীবনের রোমান্টিক আবেগময় দিকটি রূপায়িত করতে গিয়েও জৈবিক-বৃত্তির দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি। "অভয়ের বিয়ে" (১৯৩০), "তারপর" (১৯৩২) প্রভৃতি উপন্যাসে আদিম রিপুর বিচিত্র বাস্তব-নির্ভর প্রকাশকে অস্বীকার করেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক অভিজ্ঞ-দৃষ্টির সাহায্যে মানবজীবনের অন্যায়, অপরাধ, বঞ্চনা, শঠতা ও আর্থিক-সামাজিক নৈতিক মূল্যহীনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এগুলির প্রভাব কিভাবে ব্যক্তির মানসিক-নৈতিক-চারিত্রিক জীবনকে বিপন্ন করে তার সুনিপুণ ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছেন। তাঁর রচনায় এই ক্রুর নগ্নতা, আদিম অমোঘ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখে সমালোচক 'ক্রিমিনাল মর্বিডিটি'র কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন।

বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে দেহচেতনা, সাধারণ জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও একধরণের পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছিল। এ ব্যাপারে

"ভারতী" পত্রিকার (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) শেষ পর্বের লেখকগণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে তাঁদের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্র রোমান্টিকতার প্রতি। তাই প্রায় সমকালে নরেশ-চন্দ্র তাঁর রূঢ় বাস্তব-জীবনচেতনা নিয়ে এঁদের কাছাকাছি এলেও এঁদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলেন। বলা যায় তিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়দশকের পৃথক পথ সন্ধানী লেখক হয়েই রইলেন।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে যে মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার অনেকটাই ফ্রয়েডিয় চিন্তা চেতনার ফসল। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে প্রায় সারা পৃথিবীতেই সিগ্‌মুণ্ডফ্রয়েড্ ও হ্যাভলক এলিসের মনোবিকল তত্ত্ব প্রাধান্য-লাভ করে। ফ্রয়েডীয় চিন্তায়—'মানুষের সত্যকারের প্রবণতাই হলো অন্যায়ের দিকে'। শুধু তাই নয়, মানুষের চারিত্রিক গঠনের মূলে 'লিবিডো' ও 'যৌন-মনস্তত্ত্বে'র ভূমিকা অনেকখানি বলে তাঁরা প্রমাণ করেন। অবচেতন মনের সক্রিয় সংঘাতের প্রভাবে মানবচরিত্র নিয়ত পরিবর্তমান এই বিশ্বাস ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বের এই নতুন ব্যাখ্যার ফলে দেহাতীত রোমান্টিক প্রেমভাবনার জগতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ বড়োরকমের রদ-বদল দেখা দেয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই তত্ত্ব যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তা বলা বাহুল্য। প্রতীচ্যের সাহিত্য ভাবনার অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যেও দেহ-কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার বাস্তবরূপের প্রকাশে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। নরেশচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই পাত্র-পাত্রীকে অবচেতন মনের অকুণ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কার-আদর্শে সৃষ্ট স্বাভাবিক জীবনের সংঘাতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস "শান্তি"র নায়িকা গোপা চরিত্রটি বাস্তবমুখীন হ'য়ে উঠেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংবিত স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েনে ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র তাঁর শিষ্টআদর্শ মণ্ডিত জীবন থেকে কিভাবে স্খলিত হয়েছে; সেইসঙ্গে তার পুরানো মূল্যবোধ, সতীত্বের আদর্শ, দৈহিকশুচিতা সম্পর্কে ধারণা এমনকি আধ্যাত্মিক চেতনাও আহত হয়েছে—তা লেখক বিশ্লেষণাত্মকভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিজীবনের সর্বৈবঅপূর্ণতা শেষ পর্যন্ত নায়িকার জীবনে গভীর ট্রাজিক শূন্যতা এনেছে তা নানাদিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক

কার্যকরণসূত্রে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক স্বাভাবিকভাবেই বক্তব্য-ধর্মী হয়ে উঠেছেন।

এই অবদমিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বংশগতি, জন্মগতপাপ প্রভৃতির ওপর নরেশচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশ্চাত্য অতিবাস্তবাদী লেখকদের মতো তিনিও মনে করেন—মানুষের অন্তর্নিয়ত সংগ্রামমুখর এবং তার জৈবিক-কামনা ক্রমাগত সামাজিক অর্থনৈতিক-পারিপার্শিক চাপে অবদমিত হয়ে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে পা দিচ্ছে। "পাপের ছাপ", "শুভা", "রক্তের ঋণ", "রূপের অভিশাপ" প্রভৃতি উপন্যাসে চরিত্রের ওপর এই পারিপার্শিকের পেষণ নানাদিক থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। জীবনকে এইভাবে বীক্ষণাগারে ফেলে অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ অনেক সময় এত রূঢ় ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে অনেকেই তাঁকে 'ক্রিমিনাল মনোবৃত্তি'র লেখক বলে মনে করছেন। আসলে নরেশচন্দ্র জীবনের যথাযথ রূপের প্রকাশে বিশ্বাসী। তিনি নিজেই বলেছেন—'আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মধ্যে দুই একটা আদর্শের ক্রিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি আদর্শ মানুষ গড়িতে চেষ্টা করি নাই। যারা আমার গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা তারা নিতান্তই মানুষ। তাই তাহাদের যেমন একদিকে আদর্শ আছে, অপরদিকে তাদের রক্তমাংশের শরীরটাও আছে'।

"রক্তের ঋণ", "পাপের ছাপ"—এই দুটি উপন্যাসে দুই অতৃপ্ত জন্ম অপরাধিনীর ভোগাকাঙ্ক্ষার তীব্র আকর্ষণ ও বিকৃত মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। এই দুটি চরিত্রের জৈবিক আর্তি শুধু বিকৃত মানসিকতাই সৃষ্টি করে নি, তা ক্রমে চরিত্র দুটিকে পাপাচারে দুর্জ্ঞেয় পথে কিভাবে নিয়ে গেছে এবং তাদের প্রভাবে মেঘনাদ বা নাগানন্দের মতো আদর্শনিষ্ঠ চরিত্র অপরাধবোধের আবর্তে বিপর্যস্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণোত্মক ভঙ্গিতে লেখক তুলে ধরেছেন। এই অন্যায় জীবনাচরণের মূলে যে অর্থনৈতিক বিপন্নতা, দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতা ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পীড়ণ কতদূর ও কিভাবে প্রোথিত হয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে লাঞ্ছিত করে চলেছে তা নরেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। "শুভা" উপন্যাসের নায়িকা দাম্পত্য জীবনের ভণ্ডামি, স্বামীর লাম্পট্য ও সমাজের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য গৃহত্যাগ করেছে। আত্মিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতার কথাও সে ভেবেছে এবং এরজন্য যদি তাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তাতেও তার কুণ্ঠা নেই। এই উপন্যাসে গৃহত্যাগিণী শুভা

প্রচলিত সমাজের নিষ্ঠুর চক্রে কিভাবে আবর্তিত হয়েছে ও তার স্বাভাবিক সুন্দর প্রেমধারণা লোভ ও লালসার আঘাতে কিভাবে আহত হয়েছে তা নরেশচন্দ্র নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন। অর্থনৈতিক-সামাজিক অসন্তোষ, ভোগস্পৃহা, অনাচার জীবনকে সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন করে ব্যর্থতার পথে টেনে আনে—এইসবই নরেশচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়। এই বক্তব্য সচেতনতা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। জীবন সমস্যার বস্তুমালিন্য ও সঙ্কট—যা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের কথাবস্তুকে বিশিষ্ট করেছে, তা নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের জটিল-গ্রন্থি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কার ও অসম ব্যবস্থা, বর্ণবৈষম্য, রক্ষণশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন।

জীবনের ভয়ঙ্করূপ, চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে আগ্রহী হলেও জীবন সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের কোনো নেতিমনোভাব ছিল না। শুধু পাপ-ঘৃণা-ঈর্ষার বিকৃতরূপ ব্যক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য নয়। বরং বলা যায় তিনি বাস্তব বলতে যা বুঝেছেন, তাঁকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করার কথা ভাবেন নি। 'যথার্থ' ফুরে তুলতে চেয়েছেন। তাই রুচি ও নীতির দোহাই দিয়ে রেখে ঢেকে বলেন নি। তিনি উদ্দেশ্যনিষ্ঠ ও বক্তব্যধর্মী বিষয় সচেতন লেখক। তিনি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের কালে স্বতন্ত্র ধারার লেখক ও পরবর্তী কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও কল্লোলকুলবর্ধিত বাস্তব জীবন সমস্যার রূপকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ লেখকরূপে বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তবধারাটিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

কালিদাস রায়ের ঃ

অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ

১ সব চেয়ে কম খেটে হয়েছে সমৃদ্ধ
বিনা সাধনায় তুমি হইয়াছ সিদ্ধ।
দেখুক মানে না ভাগ্য যারা এ দৃষ্টান্ত
সিদ্ধি মূলে রয় কিনা ভাগ্যই নিতান্ত।

২ তরী হলে বানচাল
যেইজন ধরে হাল
সবাই তাহারে দেয় গালি।
নীল আকাশের তলে
শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে
প্রশংসিত হয় সব হালী।

৩ সহসা যশস্বী হয় কেউ ভুঁই ফুড়ে
যে যশ ছত্রিকাসম রোদে যায় পুড়ে।

৪ অদৃষ্টের এই যে বড় ফের
স্তবগীতি গাইতে হয় অনেক পাষণ্ডের।

৫ ছিড়ে গেছে শিকে দেখ, বিড়ালের ভাগ্যে
সেও তো রুক্ষের জীব
খায় দধি থাক্ গে
ছেড়ে দাও থাক্‌গে।

কলম ও তরবারি

তরবারি গলা কেটে
করতে পারে খুন
বাধায় লড়াই কাঁদায় সবায়
এইত তাহার গুণ।

কলম দেখ রবির মত
আঁধারে দেয় আলো
করে তাহাই এই দুনিয়ার
যাহাতে হয় ভালো।

বিশদ হৃদয় ও আগুনকে নিয়ে

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

জীবন ব্যঞ্জনাময় কবিতার অংশ শুধু
শুধু শব্দ নিয়ে লোফালুফি ;
অথবা জীবন সংগ্রামের অন্য এক নাম।

ছেলেবেলার শোনা কথা, শুনে আসছি
জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে শূন্যের ভেতর, আজও।

শূন্যের ভেতরে শূন্য ;
জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে শূণ্যের ভেতরেই।

প্রাণহীন উথানে জাগি রোজ যোদ্ধবেশে,
অলৌকিক দেবতা নামে স্বর্গীয় থানে
শব্দ লুফে-লুফে।

নেহাতই বিলাস নাকি এইসব স্মৃতিভ্রংশ কথা?
কিংবা ভালো লাগে কল্পনায় ভাবতে এসব
কুর্সিতে হেলান দিয়ে ; তাই রোজ ভাবা?

ফুল বৃন্তচ্যুত হ'লে মাটি ছাড়া
কে বিশদ হৃদয় নিয়ে দিয়েছে আশ্রয়?

কে হি-হি শীতে শরীরকে গরম করতে
আগুনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়?
কিংবা পাগল হ'য়ে চলে যায়
চৈত্রমাস খুঁজে?

পুনরুজ্জীবন

রথীন্দ্রনাথ রায়

এই ঘরে কত শব্দের ঝাঁক ছুটোছুটি
রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত
একদিন সমস্ত নদীর রঙ ছিল নীল
তদ্রূপ আকাশ

ঘাসের বাগিচায় পাতা হতো চেয়ার
চারিদিকে ফুল
একদিন সমস্ত মেঘের রঙ ছিল শাদা
তদ্রূপ মানুষ

ক্রমশঃ বদলেছে দিনক্ষণ
একদিন যা ছিল আজ সমস্ত রূপকথা
রঙ আর মানুষ

চলো, ছোটো

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই যে উৎসব,—
আমার কবর ঘিরে এই কলরব
পথ দীর্ঘ করে দেয় দূর পূর্বাশার!

চলো, ছোটো, সময় তো আর
বেশি নেই ;
এই কটা গর্ত্ত আর ঢিবি পেরোলেই
হয়তো পৌঁছে যাবে সময় মতন
উঁচু ঐ টিলাটায়—
যেখানে ঢেণ্ডন,
বহু শতাব্দী ধরে প্রতিবেশীহীন

এখনও দোহন করে চলে রাত্রিদিন
বলদের কুঁজ।

সেখানে অবুঝ
এই স্পর্দ্ধিত শৃগাল
সিংহের সঙ্গে যুঝে জিতে নেয় কাল
সেখানে দাঁড়ালে পাবে
ভোরের আভাস। চলো, ছোটো
সময় থাকতে ঐ টিলাটায় ওঠো।

বাতায়ন

তাপস সিংহ

যুগ-যুগান্তের কোন সাধনায় পথ ভেঙে হাঁটা
সে কোন অন্তের দিকে চলা ?

সামনে অনুরণনের কেকাধ্বনি, নাকি কোনো কাঁটা,
তাহলে কি এপথও নিস্ফলা ?

রশ্মিহীন পথে হাঁটা, ক্রিস্টালে বিথিত প্রতিচ্ছবি
মেঘেরা কি কোনো চিঠি লেখে ?

যুগান্তের সুর যায় দিগদিগন্তে, জানি তার সবই
হৃদপিণ্ডে ঝঙ্কারে তাল শেখে।

প্রতি রাত্রি কাটে, যায় বিলাপের আলাপে সময়,
ক্লান্ত আমি, রিক্ত মনস্কাম—
রেড রোডে শুকনো হাওয়া শূণ্য খেলা হয়,
কিনে যাচ্ছি নিয়মিত বিশুষ্ক বাদাম ॥

দুটি কবিতা

কলকাতা কলকাভা

শতরূপা সান্যাল

॥ এক ॥

হেমন্তে নিবিড় সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে
শহরের ব্যস্ত পথে বিজন গলিতে
দলে দলে মানুষেরা দিনান্তের কাক
খোঁজে ঘর উষ্ণতাকে কার্তিকের শীতে

ছিল যার নৈবেদ্যের ডালি প্রত্যাখ্যাত
আজ সেই নাগিনীর ঘুম নেই চোখে
কে করে বা উষ্ণতার শাঁস আস্বাদন
জাহ্নবী সাহারা হবে বিষের ঝলকে।

শহরের বুকে হাঁটে অজস্র পৃথিবী
সহস্র বসন্ত হাসে কার্তিকের মাসে
নীলকণ্ঠ এ সময় মুখ ফিরে থাকে
রাত্রির ক্রন্দন জমে প্রতি ঘাসে ঘাসে।

॥ দুই ॥

নির্বাচনের গরম হাওয়া তাপ ছড়ায়
ক্লান্ত পায়ে ম্যারাথনের লম্বা ছুট
রং বেরঙের গল্পে কথায় পাঁক ছিটোয়
চৌমাথাটা পেরিয়ে গেলেই ব্ল্যাক আউট

কালবোশেখির ঘূর্ণি কাদের পেট ভরায় ?
বন্ধ্যা মাঠে বছর ঘোরে অজন্মায়
তপ্ত দুপুর রক্ত চক্ষু অগ্নিশ্বাস
প্রস্তুতি দিন কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়।

এমনি করে নিজের হাতে পথটাকে
করছি কেন ছিন্নভিন্ন সামনে দিক ?
অমাবস্যায় নিভিয়ে ফেলি প্রদীপখান
কেই বা জানে মন্দ ভালো ঠিক বেঠিক।

কমলেশের দিনকাল

—নন্দন সেনগুপ্ত

আজকে যখন কমলেশ-বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, পকেটে তার পুরো একটা টাকাই ছিল। মোটামুটি নিশ্চিন্তভাবে চুলে চিরুণি চালিয়ে জামাটা গুঁজেছিল প্যান্টের মধ্যে। চটিতে পা গলানোর সময় স্ট্র্যাপ আটকে রাখার জন্য পুরনো সেফটিপিনের খোঁচাটাকেও বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। দরজা খুলে সিঁড়িতে পা ফেলবার সময়ে একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপও যেন ফুটে উঠেছিলো ওর চোখে-মুখে (অন্ততঃ ওর তাই মনে হয়েছিলো)। ভারী মজা পাওয়া একটা মুখ করে পা গুণে গুণে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাচ্ছিল কমলেশ। বাঃ বেশ দেখতে তো কলকাতা শহরটা। কমলেশ এতদিন খেয়ালই করেনি। অবশ্য খেয়াল করার কথাও নয় ওর। গত কয়েক বছরে উপার্জনের চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা তো ওর মাথায় ছিলই না। চেয়েছিল, যে কোনও একটা উপায়ে কিছু উপার্জন—কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না, কমলেশও পায় নি। গত কয়েক বছর ধরে শুধু বেশ কয়েক জোড়া চটি খরচ হওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি ওর ভাগ্যে। কিন্তু তার আগে? তখন তো উপার্জনের চিন্তা ছিল না। তখনও কি কলকাতা এতখানি মজার দেখতে ছিল? কমলেশ মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু কই তেমন তো কিছু মনে পড়ে না, আসলে অতীতের সব কিছুই ও ভুলে গেছে। শৈশব-টৈশবের কথা কিছুই মনে নেই কমলেশের। মনে করার চেষ্টাও করে না। কি হবে? কোনও তো লাভ নেই। অথচ কমলেশ জানে ওর মতো ঐশ্বর্য্যময় ছেলেবেলা খুব কম মানুষের ভাগ্যে জোটে। কমলেশ লেখক নয়। যদি তা হতো, তাহলে হয়তো ওর ছেলেবেলার কথা-টথা লিখে দু'পয়সা রোজগার করতে পারতো।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে শুয়ে এইসব ভাবে কমলেশ। ভাবে নয়, ভাবত! আজকাল কোনরকম ভাবনা-চিন্তা করাও ছেড়ে দিয়েছে সে। হাতে কাজ না থাকলে ঘরের বালি খসা দেওয়ালে টিকটিকির পোকা ধরার দৃশ্য দেখে। বেশ

লাগে দেখতে। বড় আকারের পোকা হলে তো দারুণ খোলতাই হয় ব্যাপারটা। টিকটিকিটাকে কেমন যেন বন্ধু মনে হয় কমলেশের, কারণটা আর কিছুই নয়, যে পোকাগুলো কমলেশকে বিরক্ত করে তাদের ও খায়, সেইজন্যই। টিকটিকিটা চুপি চুপি পায়ে শিকারের দিকে এগোয়। কমলেশ শুয়ে-শুয়ে দেখে। বেশ বুঝতে পারে, ওর স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে উঠছে। টিকটিকিটা ঝাঁপিয়ে পড়ে, চট্ করে কামড়ে ধরে পোকাটা ছটফট করে। অদ্ভুত উত্তেজনায় কমলেশের মুখটা বিকৃত হয়ে যায়, মুখ বেঁকিয়ে বলে, "মার শালাকে মার, শালার টেঙ্রি খুলে নে।"

তারপর কমলেশ আবার চুপচাপ শুয়ে থাকে, এপাশ-ওপাশ করে আর মাঝে রাস্তার লোকজনের মাথা লক্ষ্য করে জানলা দিয়ে থুতু ফেলে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করার জন্য ওর চেষ্টার অন্ত নেই। প্রতিবারেই মুখ বাড়িয়ে দেখে ঠিকঠাক লোকটার মাথায় পড়েছে কিনা। ব্যর্থ হলেও হতাশ হয় না। একটু বিশ্রাম নেয়, আবার চেষ্টা করে।

কমলেশ বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সারা দুপুর এইসবই করছিল। মাঝে একবার ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। রাতেও যার ঘুম হয় না, দুপুরে তার ঘুম হবে কি করে। হঠাৎই ওর মনে হ'ল, মাস তিনেক আগে, সাদার্ণ এ্যাভিনিউতে ওকে পরপর তিন-চারদিন যেতে হয়েছিল, একটা চাকরীর উমেদারিতে। সেখানে একটি বাড়ির জানলায় একটি মেয়েকে দেখেছিল কমলেশ। চমৎকার দেখতে। যে ক'দিন গেছিল রোজই দেখেছিল জানলায় বসে আছে মেয়েটি। কমলেশ মনে করার চেষ্টা করল কোন্ চাকরীটার তদ্বির করতে ওখানে গেছিল। রেমিংটনের এল্, ডি, ক্লার্ক টা কি? না বোধহয়। ওঃ মনে পড়েছে, ঐ কোন্ একটা প্রেসের কম্পোজিটারের কাজ। না, তাও তো না। সেটা তো বৌবাজারে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে আবার সেই গবাক্ষবিলাসীনির ভাবনায় ফিরে এল সে। "একবার দেখে আসা যাক মেয়েটাকে", ভাবতে যা দেরী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল কমলেশ।......

......এখন কমলেশ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে কলকাতা দেখছে, বিকেলের কলকাতা। চলতে-চলতে হঠাৎ ওর নজর পড়লো একটা জুতোর দোকানের শো-কেশে। কত রকমের জুতো সাজানো। দামগুলোর ওপর চোখ বোলাতে থাকে কমলেশ। "নাঃ একশ সাত টাকার নীচে কিছু নেই দেখছি।" তারপর

সবচেয়ে বেশী দামের জুতোটা খুঁজতে শুরু করলো কমলেশ। ভালো করে খুঁজে দেখলো সাড়ে চারশর ওপরে কোনও জুতো নেই। দামটার ওপর কয়েকবার চোখ বোলাল, ভারী আরাম বোধ করল যেন। আবার হাঁটতে থাকে কমলেশ। সিনেমাহল থেকে লোক বেরোচ্ছে। কমলেশ সেই ভীড়ের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। ভালোই লাগে ওর। বেশ একটা সিনেমা দেখে ফেরার আমেজ পাওয়া যায়। ওদিকে পাতাল রেলের কাজ চলছে। নাঃ দেশটা বোধহয় সত্যিই উন্নতি করে ফেলল।

আরে! মেয়েটা একবার তাকাল না? তাকাতেই পারে, আশ্চর্য্যের কি আছে? আঃ এখন একটা ভূমিকম্প হতে পারে তো, নিদেনপক্ষে একটা গণ্ডগোল, দুটো-চারটে বোমা, লাঠি, টিয়ার গ্যাস। হলে বেশ হয়। মেয়েটার কাছে গিয়ে ও বলতে পারে, "আপনি বড্ড ভয় পেয়েছেন দেখছি। ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে।" নিজের কোনও একটা যোগ্যতা দেখানোর জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল কমলেশ।

—"কি মশাই! দেখে চলতে পারেন না?"—কমলেশ চমকে যায় ধাক্কাটা খেয়ে। একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। চট্ করে একবার মেয়েটার দিকে দেখে নেয়। হ্যাঁ, এদিকেই তো তাকিয়ে আছে। এঃ কি যা তা ব্যাপার। প্রেস্টিজে একদম গ্যামাক্সিন্। জামাটা একটু কুঁচকে গেল যেন! তাড়াতাড়ি জামাটা ঠিক করতে করতে হাত তুলে হাঁকলো কমলেশ, "ট্যা-ক-সি।" থামলো না হলুদ রঙের গাড়িটা! থামবেনা, ও জানতো তবু মেয়েটাতো দেখলো যে ও ট্যাক্সিতে চড়ার ক্ষমতা রাখে। কতদিন বাদে ট্যাক্সিকথাটা উচ্চারণ করলো কমলেশ? কে জানে? সময়ের হিসেব টিসেব বড় একটা থাকে না ওর আজকাল। কটা বাজে এখন? পাঁচটা না ছটা? যটাই বাজুক, ওর কি আসে যায়? ওহ্ না না, আসে যায় বৈকি। সাদার্ণ এভিনিউ-এর সেই মেয়েটা যদি জানলা থেকে উঠে যায়? কিন্তু এখানে এই মেয়েটাকে ফেলেই বা যায় কি করে? এও তো যাবার নামই করে না। "উঠে যা না বাবা একটা বাসে।" কমলেশ মনে মনে মেয়েটিকে অনুরোধ করে। ওর অনুরোধ রক্ষিত হয়।

কমলেশ আবার হাঁটতে থাকে। আরে! ওখানে আবার কি হচ্ছে? ওঃ বই মেলা। ঢুকবে নাকি একবার? সাত পাঁচ ভেবে পিছিয়ে আসে কমলেশ।

কে জানে বাবা, টিকিট-ফিকিট লাগবে হয়তো ঢুকতে। পকেট তো একটিমাত্র টাকা। আছে তো টাকাটা? কমলেশ একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নেয়। লোকজন জীবনপণ করে বই কিনে ঘর্মাক্তমুখে বেরোচ্ছে। কমলেশ খানিক দূর এগিয়ে যায়। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলো তাই। ঢোকার জন্য টিকিট লাগবে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা লাইন পড়েছে।

"এদের সবারই কি চাকরী বাকরী আছে?"—একবার ভাবে কমলেশ, তারপর আবার এগোয়। এত চাকরী যে কোথায় থাকে! এদিক-ওদিক তাকায় কমলেশ, যেন চাকরী খোঁজে। রবীন্দ্র সদনের প্রত্যেকটা রেলিঙের ফাঁকে অনুসন্ধান চালাতে ইচ্ছে করে ওর। যদি একটা চাকরী লুকিয়ে থাকে ওখানে। আরে, এসব কি ভাবছে ও? পাগল হয়ে যাবে নাকি শেষে? কিন্তু কি করবে এখন? সাদার্ণ এভিনিউতে যাওয়ার ইচ্ছে আর নেই। কি করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে একটা প্রণাম করলে কেমন হয়। ভদ্রলোক প্রস্তরীভূত হয়ে কতদিন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবীন্দ্র সদনের আঙিনায়। কেউ তাকায় কি ওনার দিকে? চারপাশটা একবার দেখে নেয় কমলেশ। তারপর টুক্ করে একটা প্রণাম করেই ফেলে রবি ঠাকুরকে। "একাডেমী অফ্ ফাইন্ আর্টস্-এর দিকে ওর নজর পড়ে। আলো দিয়ে সাজানো। ব্যাপারখানা কি? ধীর পায় কমলেশ এগোয়। ওরে বাবা? এক্সিবিশন্ চলছে দেখছি। পনেরশ টাকা। দামটা বেশ মনঃপূত হয় কমলেশ। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে ছবিটা। ছবির ফ্রেমে কোনও ফাটল আছে কিনা দেখে। না ফাটল নেই। কি চক্‌চকে ফ্রেমটা। আচ্ছা ফাটল থাকলে তাতে ছারপোকা থাকতো? কমলেশের ভারী ইচ্ছে হ'ল জানতে "একাডেমী অফ্ ফাইন্ আর্টস্"-এ ছারপোকা পাওয়া যায় কিনা জানতে। ভাবল কাউকে জিজ্ঞেস করবে কিনা। "অবশ্য ছারপোকাই যদি হয়, আমার বিছানা ঝাড়লেই তো পাওয়া যাবে" ভেবে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করল যেন কমলেশ। বেশীক্ষণ ভেতরে থাকল না। দূর! দামী ছবি একটাও নেই, যেটার সামনে বেশ বোদ্ধার মত দাঁড়িয়ে দশটা মিনিট অন্ততঃ কাটিয়ে দেওয়া যায়।

হাতে এত সময় নিয়ে কি করবে কমলেশ ভেবে পায় না। এত এত সময় কেন? পৃথিবীটা কেন আরো জোরে ঘুরছে না? "সময় খরচ করার একটা ভালো উপায় কেউ আমায় বলে দিতে পারে না?"—মাথার ভেতরটা কেমন

যেন অস্থির লাগে কমলেশের। ঘন ঘন মাথা নাড়ায়, ঘামে, দ্রুত পায়ে সামান্য হেঁটে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অন্ধকার ময়দানের দিকে তাকায়। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার বড্ড প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কমলেশ। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবে? নাঃ, ওখানে মানুষ বড় সুখী-সুখী মুখ করে বসে থাকে, যেটা কমলেশ একদম পছন্দ করে না ঃ ওখানে যাওয়া চলবে না। তাহলে কমলেশ কোথায় যাবে? এখনই কি ওকে ওর ঘরে ফিরে যেতে হবে? কিন্তু করবেটা কি সেখানে? সন্ধ্যের অন্ধকারে ঐ চিলেকোঠা থেকে রাস্তাও ভালো দেখা যায় না। তা যদি যেতো, তাহলে লোকেদের মাথা লক্ষ্য করে থুতু ফেলেও খানিকটা সময় কাটতো। কি করা যায় তাহলে? কমলেশ ভাবতে থাকে। একবার ডান চোখ বন্ধ করে, পরক্ষণেই বাঁ চোখ বন্ধ করে, কখনও বা ঘাড় বেঁকিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কমলেশ ভাবতে থাকে এখন সে কি করবে। বাড়ী ফিরবে না রাস্তায় ঘুরবে, আচ্ছা টস্ করা যাক্। পকেটের এক টাকার মুদ্রাটা বার করার জন্য হাত ঢোকাতেই বুকটা ধক্ করে উঠল ওর। নেই। যতদূর হাত যায়, কমলেশ হাতটাকে ঢুকিয়ে দিল পকেটে। পকেট পুরোই ফাঁকা। অন্য পকেটটাও দেখলো। ফল একই। কি হবে এখন?

মূর্তির মত কমলেশ দাঁড়িয়ে থাকে। কোথায় হারালো টাকাটা? সেই ধাক্কা খাওয়ার সময়? না তারপরেও তো টাকাটা পকেটে ছিল বলেই মনে হচ্ছে। তবে কি একাডেমীতে যখন পকেটে হাত দিয়ে ছবি দেখছিলাম, তখনই কোনওভাবে পড়ে গেছে? বুকের ধবধকানিটা একটু কমে গেছিল, আবার অসম্ভব রকমের বেড়ে যায় সেটা।

হ্যাঁ, হয়েছে—সময় কাটানোর উপায় পেয়ে গেছে কমলেশ। টাকাটা খুঁজবে ও। রবীন্দ্র সদন থেকে গ্র্যাণ্ড হোটেল—এই পুরো রাস্তাটা ও খুঁজে বেড়াবে। অন্তত রাত দশটা অবধি নিশ্চয়ই কেটে যাবে পুরো অঞ্চলটার প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজতে।

টাকাটা পাবেনা ও জানে, কিন্তু তাতে কি? আজকে রাতের ঘুমের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লান্তিটুকুও কি ততক্ষণে ও সঞ্চয় করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। হঠাৎ আশাবাদী হয়ে ওঠে কমলেশ। রাস্তার ধুলোর দিকে নজর রেখে আস্তে আস্তে এগোয়।

—"কি খুঁজছেন দাদা?"

—"কিছু না।"

—"কিছু হারালেন নাকি দাদা?"

—"কিছু না।"

—"এই যে দাদা…"

—"কিছু না"…"কিছু না"…"কিছু না"…"কিছু না"…"কিছু না"…।

মাছি

ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড

—"তোমার এই জায়গাটা বেশ আরামের"। সবুজ গদিওয়ালা আরাম-চেয়ার থেকে মাথা বাড়িয়ে বললেন বুড়ো উডিফিল্ড। ঠিক যেমন করে একটা বাচ্চা প্যারাম্বুলেটার থেকে উঁকি মারে। ওঁর কথা শেষ। এবার ওঠার সময় হ'ল। কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই। যবে থেকে রিটায়ার করেছেন…মানে স্ট্রোকটা হবার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা ওঁকে ঘরে বাক্সবন্দী করে রেখেছে। শুধু মঙ্গলবারটা ছুটি। মঙ্গলবার উনি সাজগোজ করে, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে চলে আসেন শহরের এই অফিস্ পাড়ায়। সারাদিনের জন্যে। সারাদিন তিনি কি করেন এখানে সেটা অবশ্য ওঁর স্ত্রী আর মেয়েরা আন্দাজ করতে পারেন। ওরা ভাবে বন্ধুদের বিরক্ত করেন। তাই হবে। তবুও ফেলে আসা কিছু ভাল লাগা ছাড়া যায় না, গাছ যেমন তার শেষ পাতাগুলোকেও আঁকড়ে ধরে থাকে। সুতরাং এখন উডিফিল্ড বসে আছেন। সিগারেট টানছেন আর ওঁর বন্ধুর দিকে প্রায় লোভাতুরভাবে তাকিয়ে আছেন। বস্ বসে আছেন তাঁর অফিস-চেয়ারে—এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। উডিফিল্ডের চেয়ে না হোক বছর পাঁচেকের বড় অথচ এখনও ডাঁটো, এখনও নিজের সমস্ত কিছুই তাঁর স্বনিয়ন্ত্রণে। তাঁকে দেখলেও ভাল লাগে।

আয়েশ আর প্রশংসা মিশ্রিত গলায় বুড়ো বলেন, "সত্যিই এই জায়গাটা বেশ আরামের"। "অবশ্যই"—বস্ একমত হন। সত্যি বলতে কি তিনি নিজেও এই ঘরটা সম্বন্ধে গর্বিত। কেউ এটার প্রশংসা করলে, বিশেষতঃ উডিফিল্ড,

ওঁর ভাল লাগে। সুখপ্রদ এই ঘরটাতে বসে মাফ্লার জড়ানো নড়বড়ে ক্ষীণ-জীবী বৃদ্ধের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে একটা গভীর জোরালো সুখ উপভোগ করেন তিনি।

—"ঘরটা আমি আবার নতুন করে সাজিয়েছি"—তিনি ব্যাখ্যা করতে থাকেন—"নতুন কার্পেট, নতুন আসবাব"। হাত আর চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন লালের ওপর সাদা চক্রাকার ডিজাইনের কার্পেট, বিশালকায় বুক্-কেস্ আর ভারী টেবিল। "আর ইলেক্ট্রিক্-হিটার"—প্রায় উচ্ছসিতভাবে হিটারের ওপর সেঁকতে থাকা নরম লালচে সসেজগুলোর দিকে আঙুল তোলেন। কিন্তু টেবিলে রাখা একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফের কথা এড়িয়ে যান। সামরিক পোষাকে একটা গম্ভীর ছেলের ছবি। ওটা নতুন নয়। ওখানে বছর ছয়েকের ওপর রয়েছে।

"তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম"—মনে করার চেষ্টায় চোখ দু'টো কুঁচকে যায় উডিফিল্ডের। "কি যেন…কি যেন…যা! সকালে বেরোবার সময়ও মনে ছিল"। ওঁর হাত কাঁপে আর মুখটা ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে।

বেচারা বুড়ো, একেবারে শেষ দশা। বস্ ভাবেন। আর সামান্য দয়াপরশ হয়ে ঠাট্টার ছলে বলেন, "বলি কি, আমার কাছে ভাল জিনিস আছে। ঠাণ্ডার বাইরে বেরোবার আগে কয়েক ফোঁটা বেশ ভাল কাজ দেবে। জিনিসটা সত্যিই ভাল। একটা শিশুরও গলায় লাগবে না।" ঘড়ির চেন থেকে চাবি বের করেন। টেবিল লাগোয়া ড্রয়ারটা খুলে একটা থ্যাবড়া বোতল বার করে আনেন। "এই হচ্ছে ওষুধ"—বস্ বলেন—"যে লোকটা এনে দিয়েছে সেই বলেছে যে জিনিসটা উইণ্ডসর ক্যাসেলের সেলার থেকে সরাসরি…গোপন কিন্তু।" বুড়ো উডিফিল্ড হাঁ হয়ে যান। বস্ একটা জলজ্যান্ত খরগোশ বার করলেও উনি এতটা অবাক হতেন না। বস্ আদর করার মত করে বোতলটা বুড়িয়ে লেবেলটা দেখান। "ওটাতো হুইস্কি, নয়?" উডিফিল্ড ক্ষীণভাবে বলেন। "জানো, বাড়িতে ওরা আমায় এসব একদম ছুঁতেই দেয়না"—বসের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলেন। দেখে মনে হয় এক্ষুণি কেঁদে ফেলবেন।

"আরে এসব ব্যাপারে মেয়েদের থেকে আমরা একটু বেশীই বুঝি"। বস নিজেকে যেন সমর্থন করেন। তারপর টেবিল থেকে এক ঝটকায় দু'টো পাত্র তুলে নিয়ে মোটামুটি রকমের পরিমাণ ঢেলে দেন। "খেয়ে নাও। বুঝলে, ভালই লাগবে। আর ওতে জল মিশিও না। এসব জিনিস ভেজাল মেশানোটা

গাপ। কি বল?" নিজেরটা এক চুমুকে মেরে দিয়ে পাত্রটা টেবিলে রাখেন। গোঁফটা রুমালে ঝট্‌পট্‌ মুছে নেন। আর একচোখে বুড়ো উডিফিল্ডের চুক্‌চুক্‌ করে খাওয়া দেখেন। বুড়ো মানুষটা একবার ঢোঁক গিলে একটু চুপচাপ থাকেন। তারপর মিয়োনোস্বরে বলেন, একটু কড়া!"

কিন্তু পানীয়টা তাঁকে তাতিয়ে তোলে। জমাট মাথাটার কপাট খুলে যায়। ওঁর মনে পড়ে। "মনে পড়েছে"—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। "ভাবলাম তুমি নিশ্চয়ই শুনতে চাইবে। মেয়েরা গত হপ্তায় বেলজিয়াম গে'ছিল রেগির কবরটা দেখতে। আর সেখানেই ওরা তোমার ছেলেরটাও দেখতে পায়। দু'জনের কবরই খুব কাছাকাছি। প্রায় পাশাপাশি।"

বুড়ো থামলেন। কিন্তু বস্‌ কোনো জবাব দিলেন না। চোখের পাতা সামান্য কাঁপতে বোঝা গেল কানে গেছে। "জায়গাটা যেভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, তাতে মেয়েরা খুব খুশী"—বৃদ্ধের গলা আবার শোনা গেল।" খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে। বাড়িতে থাকলেও বোধহয় এতটা হ'ত না। তুমি তো ওখানে যাওনি, তাই না?" "না, না।" নানা কারণেই বস্‌ যাননি।

কাঁপা গলায় উডিফিল্ড আবার বলেন, "জায়গাটা বেশ কয়েক মাইল জুড়ে। বাগানের মত তক্‌তকে। প্রত্যেকটা কবরের পাশে ফুল গজিয়েছে। বেশ চওড়া-চওড়া রাস্তা।" শুনে মনে হয় যেন চওড়া রাস্তা ওঁর খুব পছন্দ। আবার একটু চুপ। তারপর আবার ঝল্‌মলে হয়ে ওঠেন। "জানো ওখানের হোটেলে এক পট্‌ জ্যামের জন্যে মেয়েদের কাছে কত নিয়েছে? দশ ফ্রাঁ! ডাকাত একদম ডাকাত। গাট্রুর্ড বলছিল ছোট্ট একটা পট্‌ চাঁদির সাইজের। আর এক চামচ জ্যাম নিতে না নিতেই দাম হেঁকেছে দশ ফ্রাঁ। গাট্রুর্ড জ্যামের পট্‌টা তুলে এনেছে। বেশ শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের। ঠিক করেছে। ওরাতো আমাদের মন-টন ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করছে। ওদের ধারণা, যেহেতু আমরা ওখানে এটা-সেটা দেখতে গেছি সেহেতু ওরা যা হাঁকবে আমরা তাই দিয়ে ফেলব। ব্যাপারটা ঠিক তাই।" উনি ধীরে-ধীরে দরজার দিকে এগোন।

"ঠিক তাই, ঠিক তাই"—বলে ওঠেন বস্‌। অথচ সত্যি ঠিক যে কি তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভাবনাও তাঁর এখন নেই। তিনি ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে আসেন। সামান্য বেতালা পায়ের শব্দ অনুসরণ করে উডিফিল্ডকে দোর পর্যন্ত পৌছে দেন।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত বস্‌ থমকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। সাদা চুলো অফিস বেয়ারাটা উঁকিঝুঁকি মারে। যেন পোষা-কুকুর মনিবের সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছে।

—"মেসি এখন আধঘণ্টা কারোর সঙ্গে দেখা করবো না। বুঝেছো? কারোর সঙ্গেই নয়"—বসের হুকুম।

—"ঠিক আছে স্যার।"

দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। দৃঢ় পদক্ষেপে কার্পেট মাড়িয়ে স্থূল শরীরটা গদি-ওয়ালা চেয়ারে ছেড়ে দেন বস্‌। তারপর একটু ঝুঁকে দু'হাতে মুখ ঢাকেন। তিনি চাইছিলেন, প্রস্তুত হচ্ছিলেন একটু কান্নার···

ছেলের কবরের প্রসঙ্গটা উডিফিল্ড আচমকা ছুঁড়ে দেওয়ায় মারাত্মক একটা ধাক্কা লেগেছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল যেন সেই জায়গাটার মাটি ফাঁক হয়ে গেছে, তার ভেতরে শুয়ে আছে ওঁর ছেলে আর উডিফিল্ডের মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। আশ্চর্য! যদিও ছ'টা বছর কেটে গেছে, আজও কিন্তু বস্‌ ওঁর ছেলেকে অন্যভাবে ভাবতে পারেন না। যেন সে এখনও ফিট্‌ফাট্‌ সামরিক পোষাকে একইভাবে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে চিরকালের মত।

"খোকা!"—একটা বোবা শব্দ বেরিয়ে আসে বুক থেকে। কিন্তু চোখে জল আসে না। অথচ আগে, মানে ছেলে মারা যাবার কয়েক মাস বাদে এমন কি দু'এক বছর পরেও শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে গভীর একটা শোকে দম বন্ধ হয়ে আসতো। চোখ বেয়ে নামতো এক ঝাঁক কান্না। সকলকেই তখন তিনি বলতেন সময়টা আসলে কোন ব্যবধানই নয়। অন্যেরা হয়তো সময়ে সবকিছু ভুলতে পারে, তাদের সব দুঃখ হয়তো ধুয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর নয়। কি করেই বা সম্ভব?

ছেলেই ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান, সম্বল। ওর জন্মের পর থেকেই বস্‌ তিলে-তিলে ব্যবসাটা গড়ে তুলেছেন। ওরই জন্যে। সে না থাকলে এসবের কোন মানেই হয় না। জীবনের আর কোন মানেও ছিল না ওঁর কাছে। কি করেই বা তিনি নিজেকে বঞ্চিত করে অমানুষিক পরিশ্রমে এই সৌধ গড়ে তুলতেন যদি না আশা থাকতো যে একদিন ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে, তাঁর যেখানে ছেদ সেখান থেকে নতুন করে শুরু করবে? সেই স্বপ্ন সত্যি হতে সামান্যই বাকি ছিল। যুদ্ধের আগে ছেলেটা অফিসের কাজকর্ম কায়দাকানুনে

বেশ রপ্ত হচ্ছিল। রোজ সকালে বাপ-ছেলে একসঙ্গে বেরোতেন আর ফিরে যেতেন একই ট্রেনে। অমন ছেলের বাপ হিসেবে তখন কত প্রশংসাই না জুটতো কপালে। আশ্চর্যের কিছু নেই। ছেলেটাও শিখছিল সুন্দর। তাছাড়া সকলেরই খুব প্রিয় ছিল। প্রত্যেকটা লোক ওর প্রশংসায় সরগরম। বগে যাওয়ার ব্যাপারটা ওর মধ্যে ছিটে ফোঁটাও ছিল না। সব সময়ই হাসি-খুশি, সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার, ছেলে মানুষ চেহারা আর কথায়, "সিম্‌প্‌লি দারুণ!" বলার অভ্যাস।

অথচ সব কেমন শেষ হয়ে গেল। যেন অমন কোনদিন কিছু ছিল না। মনে পড়ে সেই অভিশপ্ত দিনটার কথা। মেসির আনা টেলিগ্রামটায় অফিসটাই যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল। "গভীর দুঃখের সংগে জানানো হচ্ছে···"। সেদিন অফিস ছেড়ে বেরিয়েছিলেন—একটা স্বপ্নহীন ভাঙা-চোরা মানুষ।

ছ'বছর হল। ছ'-ছ'টা বছর·····কত দ্রুত চলে গেছে সময়। অথচ যেন কালকের ঘটনা। বস্‌ মুখ থেকে হাত দু'টো সরিয়ে নিলেন। বিভ্রান্ত। যেমন চাইছিলেন অনুভূতিগুলো ঠিক তেমন আসছিল না। তত তীব্র নয়। ছেলের ছবিটা আবার দেখবেন ভাবলেন। কিন্তু ওই ছবিটা ওঁর খুব প্রিয় নয়। ভঙ্গিটা একটু অস্বাভাবিক। কেমন যেন ঠাণ্ডা, কঠিন। ছেলেটাকে আদতে কিন্তু মোটেই অমন দেখতে ছিল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বসের নজর পড়ল বড় দোয়াতটায়। একটা মাছি পড়েছে। দুর্বল, কিন্তু কি সাংঘাতিকভাবে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। সরু সরু ঠ্যাং-গুলো কাঁপছে। যেন বলছে বাঁচাও বাঁচাও! কিন্তু দোয়াতের ধারটা ভিজে, পিচ্ছিল। ওটা আবার ভেতরে পড়ে গেল, কালিতে পড়ে সাঁতরাতে লাগল। বস্‌ একটা কলম দিয়ে মাছিটাকে তুলে সামান্য ঝাঁকিয়ে ব্লটিং কাগজের ওপর রাখলেন। একটা মুহূর্তের জন্যে মাছিটা তার চতুর্দিকে শুকিয়ে ওঠা কালির ওপর নিশ্চুপ বসে রইল। তারপর সামনের পা গুলো কেঁপে উঠল, কাগজটাকে আঁকড়ে ধরল। আর ছোট স্যাঁৎস্যাঁতে শরীরটাকে টেনে তুলে ডানা থেকে কালি ঝেড়ে ফেলার বিশাল কাজে মন দিল। ওপর থেকে নীচে একটা পা একটা ডানায় টোকা দিতে থাকল। ক্রমাগত। মুহূর্তের বিরতি। তারপর মনে হ'ল যেন মাছিটা সাবধানে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে একটা দু'টো করে ডানা মেলার চেষ্টা করছে। অবশেষে পারল। এবার বসে পড়ে বেড়ালের মত পা

দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করল। সামনের ছোট্ট পা গুলো একবার পরস্পরের সঙ্গে ঘষে নিল, যেন ফুর্তিতে। ভয়ানক বিপদটা কেটে গেছে। বেঁচে গেছে। জীবনের জন্যে মাছিটা এখন প্রস্তুত।

সেই মুহূর্তে বসের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। কলমটা দোয়াতে ডুবিয়ে নিয়ে চওড়া কব্জিটার ভর ব্লটিং কাগজের ওপর রাখলেন। আর যেই না মাছিটা ডানা ঝাঁকিয়ে উড়তে যাবে কালির একটা বড় ফোঁটা পড়ল টপ করে। এখন ওটা কি করবে? বেচারা মাছিটা কুঁকড়ে গেল। হতচকিত। নড়তেও ভয়। জানে না এরপর কি বিপদ আসবে।

তারপর, যেন অসীম যন্ত্রণায়, নড়েচড়ে উঠে বিন্দুর মত শরীরটা টেনে নিল। সামনের পা গুলো কাঁপালো, আঁকড়ে ধরলো আর প্রথম বারের চেয়ে ধীরে-ধীরে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করলো।

ছোট্ট বিচ্ছু শয়তান একটা—বস্‌ ভাবলেন এবং মাছিটার সাহসের সত্যি প্রশংসা করলেন। এভাবেই সবকিছুর মোকাবিলা করতে হয়; একটাই সঠিক মানসিকতা। কখনো বোলো না সব শেষ। প্রশ্নটা আসলে···কিন্তু মাছিটা ধৈর্য ধরে কঠিন পরিশ্রম শুরু করেছে। বস্‌কে হাত চালাতে হ'ল, ঠিক সময় মত আরেকটা কালো ফোঁটা মাছিটার পরিষ্কার করা গায়ে ফেলতে। আবার? উদ্বেগের দুঃসহ মুহূর্তটা কেটে গেল। সামনের পা গুলো আবার কাঁপছে। দমকা একটা স্বস্তি অনুভূতি করলেন বস্‌। মাছিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে নরম স্বরে বললেন, "শয়তান কোথাকারে···"। এবং ফুঁদিয়ে মাছিটার গা-শুকোনোর সাহায্য করার কথাটা মাথায় খেলে গেল চমৎকারভাবে। তবুও এবার প্রাণীটার উদ্যোগে কেমন একটা ভাঁটাপড়া দুর্বল ভিতু ভিতু ভাব। বস্‌ মনস্থির করলেন। এবারই শেষ। এবং কলমটা দোয়াতে ডুবিয়ে নিলেন।

তাই হল। এই শেষ ফোঁটাটা ভেজা ব্লটিং কাগজে পড়ল। জড়িয়ে পড়া মাছিটা পড়ে রইল। নড়লো না। পেছনের পা গুলো শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সামনের পা গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। "কি হল? ওঠ!" বস্‌ চেঁচিয়ে উঠলেন। এবং কলমটা দিয়ে ঠ্যালা দিলেন। কিন্তু বৃথা। কিছুই হ'ল না। আর হবেও না। মাছিটা একদম শেষ।

মৃতদেহটা কাগজকাটা ছুরি দিয়ে তুলে বস্‌ বাতিল কাগজের ঝুড়ির দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু হঠাৎই গাটা ঘুলিয়ে উঠল। অসহ্য খারাপ লাগার টক

অনুভূতি। সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলেন। চমকে উঠে মেসিকে ডাকার জন্যে ঘন্টিটা বাজিয়ে দিলেন।

—"কয়েকটা নতুন ব্লটিং কাগজ নিয়ে এস," কড়া সুরে বললেন, "তাড়াতাড়ি।" আর বুড়ো কুকুরের মত লোকটা ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে যেতেই ঘটনাটার আগে কি ভাবছিলেন সেটাই মনে করার চেষ্টা করলেন। কি ভাবছিলেন তিনি? কি যেন···রুমালটা বার করে ঘাড়ে গুঁজে নিলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। কিছুতেই নয়।

অনুবাদক ঃ অরুণাভ ঘোষ

সমালোচনা

ভ্রমর পাখার অন্ধকারে

নন্দিতা সেনগুপ্ত

কবিতার ভাষা, কবিতারই। তবে লোকমুখের ভাষায় লোকস্মৃতি জাগিয়ে তোলা তার একটি বিশেষ দিক। বিশেষভাবে আধুনিক কবিতায়। ব্যক্তিস্মৃতির সঙ্গে ব্যাপক জাতীয় স্মৃতির সাযুজ্য কবিতাকে নিজস্ব একটি স্বাধীন সার্বভৌম রূপ দেয়, যেখানে কবি নিজেই সম্রাট। বর্তমান সময়ে কেউ কবিতায় ব্যক্তি-স্মৃতিকেই একমাত্র অনন্য করে তুলে ধরতে চান, তাঁর সঙ্কীর্ণ দ্বীপেই মহান পৃথিবীর স্বাদ আনতে চান। কেউ বা লোক প্রবাহের, চৈতন্যের মহাদেশে আপনার বিস্ময় বিজড়িত পায়ে হাঁটতে থাকেন এবং স্মৃতির ভুবনও বিস্তৃত ও গভীর করে তোলেন। রবি গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় পথের যাত্রী। তাঁর 'কবিতার কাছাকাছি একা' এমন অভিজ্ঞানই বহন করে। তাঁর অনেক কবিতাই মনের মধ্যে একটা রেশ রেখে যায়। একটা বিষণ্ণতাবোধ, একটা নিরুচ্চার ক্ষোভ ও গভীর আর্তি তাঁর প্রায় সব কটি কবিতাতেই ছড়ানো রয়েছে। রবি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি কবিতা পড়লে মনে হয় বড়বেশী গতানুগতিক। কিন্তু তার পরের কবিতাগুলিতে তাঁর একটা আন্তরিক প্রয়াস চোখে পড়ে। এই কবিতাগুলিতে বোঝা যায় যে তিনি ভেঙে চুরে নতুন একটা কিছু তৈরী করতে চাইছেন। তাঁর অনেক কবিতাই আমাদের ভাল লেগেছে। তাঁর "পিছনে দিগন্ত রেখা" কবিতার কয়েকটি লাইন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, যেমন—

পিছনে তোমার মৌন ভন্ধকার
সমুদ্রের মত ধূপের ধোঁয়ার মত
ভালোবাসা তাকে ভালোবাসা
ভেবে যায়।

বাউল রাখে না মনে বাউল জানে না শীত স্মৃতি
পিছনে দিগন্ত রেখা ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে থাকে।

এর মধ্যে অনর্থক কোন জটিলতা নেই। নেই হঠাৎ চমকলাগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। এখানে তিনি এক সুদূর রোমান্টিকতা আমাদের উপহার দিয়েছেন!

তাঁর "পাতা ঝরে" এই কবিতার লাইনগুলো আমাদের মনে করায় এক অপার শূন্যতা। উল্লেখ্য লাইনগুলো থেকে তা বোঝা যায়। যেমন—

"দিগন্ত ঝাঁপিয়ে সোজা ছুটে যাওয়া
ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রেন।
শূন্য নীল পারাবার ভেঙে উড়ে যাওয়া এক পাখী।

কিন্তু একটা সুদূর রোমান্টিকতা ও শূন্যতা ছাড়াও তাঁর "বদলে নেব" কবিতায় তিনি অন্য সুরে কথা বলেছেন। তাঁর ভেতর থেকে একটা জ্বালা ও ক্ষোভ বেরিয়ে এসেছে। এই কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় তিনি যেন কি এক প্রচণ্ড রাগে জ্বলছেন।

তাই দেখা" কবিতার কয়েকটি পঙক্তি আশা করছি পাঠক মনকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করবে। কারণ পঙক্তিগুলি ভাবিয়ে তোলার মত। যেমন—

"দেখা হয়েছিল শুধু তাঁকে
একা একলা সহজ পোষাকে
তিনি কবি, মনে পড়ে তাঁর
অশ্রুবাষ্পময় অন্ধকার।

তাঁর শেষ কবিতা "কবিতার কাছাকাছি একা"। এখানে সত্যিই তিনি তাঁর কবিতার গভীরে একা:

"পদ্মের পাতার মত গোপন জলে
ফোঁটা ধরে রইল স্মৃতি
নির্ধারিত সঙ্গিনীও গুণগুণিয়ে
গেল নীল ভ্রমর পাখার অন্ধকারে
বড় ভাঙাচোরা এই উত্তর তিরিশে আজো
দুরারোগ্য কবিতার কাছাকাছি একা।"

রবি গঙ্গোপাধ্যায়-এর কবিতার কাছাকাছি একা

সংস্কৃতি সংবাদ

এবারের সংস্কৃতি-সংবাদে কিছু অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আগে টুকরো খবর কিছু জানাই কিঞ্চিৎ বিলম্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য ডঃ অনদিনাথ দাঁ-র রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় গত সংখ্যায় জানানো যায় নি। শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'প্রেম নেই' উপন্যাসটির জন্য পেলেন '৮২-র বঙ্কিমস্মৃতি পুরস্কার। এই আনন্দ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশের কবি সচেতন পাঠকের বিশেষ পরিচিত শ্রী স্নেহাকর ভট্টাচার্যের পরলোকগমন আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করছে। তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাই। বাংলা ছোট গল্পের বিশিষ্ট লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তিরোধানে আমরা মর্মাহত।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খবর অবশ্যই বিশ্বকাপ ফুটবলে ইতালির জয়, উইমবলডন টেনিস এবং ভারতের সদ্যসমাপ্ত ইংলণ্ড সফর। বর্তমানে চলছে কলকাতার ঘরোয়া ফুটবল লীগ। দিল্লী-কলকাতা মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক ও কলকাতা দূরদর্শনের চেষ্টার সমন্বয় বিশ্বকাপ ফুটবলের কিছু খেলার সরাসরি দূরদর্শনে প্রচার। স্বভাবতঃই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষই সৌভাগ্যবান। ওদিকে দিল্লীতে এশিয়াডের প্রস্তুতি নিয়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রসঙ্গে কিছু বিতর্ক এখন সংবাদ-পত্রের পাতায়। এশিয়াডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের সম্মান। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক সেটাই একমাত্র কাম্য।

এ বছর কয়েকটি রাজ্যে বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গে খরা পরিস্থিতি ভয়াবহ। অথচ অল্পদিন পরেই গ্রামবাংলার নিজস্ব উৎসব ভাদু। অনাবৃষ্টি আর অনটনের পরিস্থিতিতে ভাদুর গান জমবে কি?

হাজার বছরের অভিজ্ঞান/দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

১০৪০ খৃষ্টাব্দে বরফ ঢাকা হিমালয়ের বুক চিরে একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু এগিয়ে-ছিলেন তিব্বতের দিকে, যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তারপরে একে একে কেটেছে প্রায় হাজারটা বছর। চলতি দিনের যান্ত্রিক সভ্যতা সত্ত্বেও যে পথ অতি দুর্গম—সেদিনে সেই দুর্গম পথ ভেঙে বিক্রমশীল

মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর গিয়েছিলেন তিব্বতে—বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে। এক জাতিকে আঁধার থেকে আলোয় তুলে আনতে।

বিক্রমশীল বিহারে দীপঙ্কর অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক তিব্বতী ভিক্ষু, জ্যাতোন সেঙ্গে, তাঁর কাছে শাস্ত্রপাঠ করেন। সেঙ্গে ও তিব্বত থেকে আগত ভিক্ষু নাগছো ছুলঠিম জলবার অনুরোধেই দীপঙ্করের বৃদ্ধ বয়সে বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে তিব্বত যাত্রা। তৎকালীন তিব্বতরাজ জলছুরওদ ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্যে জলবাকে ভারতে পাঠান বৌদ্ধাচার্যকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

আজ থেকে ঠিক হাজার বছর আগে, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা কল্যাণশ্রী ও মাতা রাণী প্রভাবতী। তিনি নিজে পরিচিত ছিলেন চন্দ্রগর্ভ নামে। বাল্যকালে শিক্ষালাভের পর প্রথম যৌবনেই তন্ত্র মতে দীক্ষিত হন চন্দ্রগর্ভ। সেযুগের তান্ত্রিক প্রাধান্য এর কারণ কিন্তু পরে তিনি শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক চন্দ্রগর্ভের নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এরপরে জ্ঞান পিপাসু শ্রীজ্ঞান সাগর পাড়ি দিয়ে পৌছান সুবর্ণদ্বীপে। সেই ১০১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সেখানকার মহাচার্য ধর্মকীর্তির শিষ্যত্ব নেন, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ফিরে আসেন দেশে। প্রথমে তিনি মহাবোধি বিহারে ধর্মীয় বিতর্কে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, এরপর মগধরাজ নয়পালের অনুরোধে বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে নয়পাল ও কর্ণরাজ্যের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে মধ্যস্থতা করে শান্তি স্থাপন করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে দুই পক্ষের বন্ধুত্ব স্থাপন করানোর মধ্য দিয়ে তিনি বুদ্ধের শান্তির বাণীকে স্মরণকরেন।

১০৪০ খৃষ্টাব্দে যে যাত্রা শুরু তার শেষ ১০৪২-এ পশ্চিম তিব্বতে। এখানে প্রচুর আপ্যায়ন ছিল তার অপেক্ষায়। তিব্বতে বহু ভিক্ষু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে জয়াকরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। মূলতঃ জয়াকরের সহায়তায় তিনি সরল, ধর্মভীরু ও কু-সংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতীদের নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ধর্ম প্রচার করেন। এরপর দীপঙ্করের ইচ্ছা ছিল আবার দেশের মাটি ছোঁয়ার, কিন্তু পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা আর হ'ল না। তারপর শ্রীজ্ঞান মধ্য তিব্বত ভ্রমণ করে সেখানেও জাগরণের প্রকাশ ঘটালেন।

—স্বর্ণেন্দু সেন

With Best

Compliments from :

SUN INDUSTRIES

1/B, RAMAKANTA SEN LANE

CALCUTTA-700067

Phone { Office : 35-9664
35-8238
Factory : 57-3837

A QUARTERLY NO, 49/82 AUG. '82 Price Rs. 1.

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে পরিকল্পিত।

বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি গ্রন্থ লিখছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩৬টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

শতরূপা সান্যাল কর্তৃক শ্রীদুর্গা প্রেস, ১৫৮/১/১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং ২১/২, ডঃ দীরেন সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।